দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 24 MAY-2005

১ ... ৬

শিক্ষায় দুর্নীতি এখন গা-সওয়া ॥ টাকা আদায়ের ফন্দি-ফিকির রূপকথাকেও হার মানায়

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ রংপুর পুলিশ লাইন স্কুল এ্যান্ড কলেজের এক ছাত্রী এইচএসসি পদার্থ বিজ্ঞানের খাতায় নিজের মোবাইল নম্বরটি লিখে রেখেছিল। পরীক্ষা খারাপ হওয়ায় এই কৌশল। পরীক্ষককে সে অনুরোধ করেছিল, ফোন করবেন। বেচারা পরীক্ষকও হ্যালো করলেন। ছাত্রীটি আরও সাত বান্ধবীর সঙ্গে পরীক্ষকের যোগাযোগ করিয়ে দেয়। চুক্তি হলো, প্রত্যেকে ১৫ হাজার টাকা দিলে জুটবে প্রায় শতভাগ নম্বর। পরীক্ষক তো মহাখুশী, উজাড় করে দিলেন নম্বরের ভাণ্ডার। যে খাতায় কম লেখা ছিল সেটিও ভরে ফেললেন। তাত্ত্বিক ৭৫ নম্বরের মধ্যে কেউ পেল ৭২, কেউবা ৭৩। কিন্তু বিধিবাম! আট ছাত্রীর অস্বাভাবিক নম্বর পাবার বিষয়টি সৃষ্টি

(৬ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষায় দুর্নীতি

(প্রথম পাতার পর)

করে চাঞ্চল্য। কেঁচো খুঁড়তে বেরিয়ে আসে সাপ। পুনরায় নিরীক্ষা করে একই খাতায় পাওয়া যায় দু'রকম হাতের লেখা। তদন্তে ধরা পড়ে শিক্ষক ও তাঁর ছাত্রীদের কীর্তি। রাজশাহী শিক্ষাবোর্ড আট ছাত্রীকে পাঁচ বছরের জন্য বহিষ্কার করেছে। ওদের কেউ কেউ দেশের বাইরে পড়তে যাবার চেষ্টা করছে। এক কাস্টমস কর্মকর্তার মেয়ে অবশ্য দু'লাখ টাকা খরচ করে শাস্তির মেয়াদ দু'বছর কমিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক আমলা আত্মীয় হবার সুবাদে বেঁচে গেছেন শিক্ষক নামের কলঙ্ক তাজুল ইসলাম।

কক্সবাজার কলেজের এক শিক্ষক ওএমআর ফরম পরিবর্তন করে ধরা পড়লে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন তাঁকে সাময়িক বরখাস্তের নির্দেশ দেন। বরখাস্ত হওয়া শিক্ষককে আদালতও শাস্তি দেয়। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাঁকে উল্টো পুরস্কৃত করেছে। দুর্নীতিবাজ এই শিক্ষক এখন একটি সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ। বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, শিক্ষায় এ রকম অসঙ্গতি এবং দৃষ্টান্ত আছে।

প্রাথমিক থেকে শিক্ষার সকল স্তরে টাকার সঙ্গে নম্বরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। শিক্ষায় ঘুষ ও দুর্নীতি এখন গা-সওয়া ব্যাপার। টাকা আদায়ের ফন্দি-ফিকির আজকাল রূপকথাকেও হার মানায়।

গত ১৬ এপ্রিল ২০০৫ এসএসসি ব্যবহারিক পরীক্ষার দিন জনকণ্ঠে ফোন করেন এক অভিভাবক। জানালেন, এসএসসি ব্যবহারিক পরীক্ষা শুরুর আগে তাঁর সন্তানসহ সকল পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে নেয়া হয়েছে মাথাপিছু ৫০ টাকা। তাঁর সন্তানের কাছে টাকা না থাকায় সে সহপাঠীর কাছ থেকে ধার নিয়েছে।

সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে অবস্থিত বিসিএসআইআর হাইস্কুলে খোঁজ নিলে শিক্ষক রমেশ বাবু ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেন। কেন্দ্র সচিব আবু তাহের বলেন, ব্যবহারিক পরীক্ষার দিন বাইরে থেকে আসা শিক্ষকসহ স্কুলে সবারই পরিশ্রম বেড়ে যায়। আপ্যায়ন ও দুপুরের খাবার জন্য কিছু টাকা যোগাড় করা হয়েছে। তবে কাউকে টাকা দিতে বাধ্য করা হয়নি।

এসএসসি, এইচএসসি এবং ডিগ্রী পরীক্ষার ফরম পূরণ নিয়ে চলে নৈরাজ্য এবং বাণিজ্য। কোন প্রতিষ্ঠান এক হাজার টাকা আবার কোন প্রতিষ্ঠান সাড়ে চার হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর শাহেদা ওবায়েদ বলেন, কিছু প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না।

পরীক্ষায় নম্বরের সঙ্গে টাকার সম্পর্ক এখন 'ওপেন সিক্রেট'। টাকার বিনিময়ে বা পক্ষপাতিত্ব করে নম্বর বাড়ানোর মতো গর্হিত অন্যায়ের অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। দেশের বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক জাফর ইকবাল একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, খাতায় নম্বর বাড়ানো নিয়ে যেসব কাণ্ড ঘটে তা শুনলে কানে আঙুল গোঁজার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়।

শিক্ষার স্তরে স্তরে এখন টাকার ছড়াছড়ি। নানা রকম চাঁদা, বহুবিধ ফিসের চাপে অভিভাবকদের অনেকেই বোবা কান্নায় বুক ভাসান। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-বাংলাদেশের গত ২০ এপ্রিল প্রকাশিত জরিপে বলা হয়েছে, এক বছরে কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নয় খাতে প্রায় ৫৪ কোটি ৬৫ লাখ টাকা চাঁদা ও ফী হিসেবে অতিরিক্ত নেয়া হয়। দেশের প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা বছরে মাথাপিছু গড়ে ৫৮ টাকা বিভিন্ন খাতে চাঁদা দিয়ে থাকে।

জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, প্রতিবছর শিক্ষার্থী বা অভিভাবকের আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা না করে ফী বৃদ্ধির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা বোর্ড তহবিলে জমা হচ্ছে— যেটা অন্যায়, অনুচিত।

এদিকে বিভিন্ন বোর্ডের স্ট্যান্ড করা ছাত্রছাত্রীদের ছবি ছাপিয়ে তাদের লিনিশিপ করা হচ্ছে। কোচিংয়ের নামে অভিভাবকদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে আর্থিক বোঝা। রাজধানীতে মাসে লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করা বাণিজ্যিক প্রাইভেট টিউটরের এখন ছড়াছড়ি। শান্তা ম্যাডাম-বিপ্লব স্যারের নোট কেনার জন্য ছাপানো পোস্টারে ছেয়ে গেছে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা। অমুক স্যার, তমুক ম্যাডামরা এখন বিদ্যা বাণিজ্যের সওদাগর। নীলক্ষেতের বই বা ফটোস্ট্যাটের দোকানে নোটিস দিয়ে বলা থাকে, কোথায় যোগাযোগ করলে ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত হ্যান্ডনোট পাওয়া যাবে!

এদিকে শিক্ষক রাজনীতির নামে একশ্রেণীর সুবিধাভোগী 'শিক্ষক রাজনৈতিক' লেবাস পরে লুটপাট করছে। দেশে এই মুহূর্তে প্রায় ৩০টি শিক্ষক সংগঠন রয়েছে এবং বেশিরভাগই প্যাডসর্বস্ব। একজন সভাপতি এবং একজন সাধারণ সম্পাদক হলেই সংগঠন তৈরি করা যায়। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির নামেই রয়েছে আট থেকে দশটি সংগঠন। শিক্ষা বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়া কতিপয় শিক্ষক নেতা তদ্বির, ঘুষ, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, বইয়ের কমিশন আদায় প্রক্রিয়ায় জড়িত। এমনকি শিক্ষক নেতাদের অনেকে মামলা করছেন একে অপরের বিরুদ্ধে। সর্বশেষ শিক্ষক নেতা নজরুল ইসলাম সরকার সমর্থক শিক্ষক নেতা মোঃ সেলিম ভূইয়ার বিরুদ্ধে ভুয়া সনদ এবং অভিজ্ঞতার মিথ্যা কাগজ দাখিল করে চাকরি নেয়ার অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করলে সৃষ্টি হয়েছে চাঞ্চল্য।

এদিকে বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠানোর আড়ালে চলছে আদম পাচার। রাজধানীতে কনসালট্যান্সি ফার্ম খুলছে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কলেজের অধ্যক্ষ পর্যন্ত কোচিং সেন্টারের মালিক হচ্ছেন। ভুঁইফোঁড় কনসালট্যান্সি প্রতিষ্ঠানে সয়লাব এখন ঢাকা। কাজ করে বা বৃত্তি নিয়ে পড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে এমন প্রলোভনে বিদেশের মাটিতে গিয়ে বিপাকে পড়ছে অধিকাংশ শিক্ষার্থী। বেশিরভাগ কনসালট্যান্সি প্রতিষ্ঠান অভিভাবকের আজীবনের সঞ্চয় বা ভিটামাটি বিক্রি করা টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে, অনেক পরিবার প্রতারিত হয়ে পথে বসছে। বিদ্যা ব্যাপারীদের খপ্পরে পড়ে কারও কারও ভাগ্যের শিকে অবশ্য ছিঁড়ছে, কিন্তু প্রতারিত হচ্ছে সিংহভাগ স্বপ্নসন্ধানী। তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার নামে নট্রামস ও যুব উন্নয়ন অধিদফতরের অনুমতি নিয়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশিরভাগই শিক্ষার্থীদের প্রতারিত এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এদিকে পরীক্ষায় পাস না করলেও শিক্ষা সনদের ফী ফরম পূরণের সময় কেটে রাখছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ড।

দেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নপত্র মুদ্রণের নামে শিক্ষা কর্মকর্তারা উপার্জনের নতুন রাস্তা বের করেছেন। দেশে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক কোটি আশি লাখ। গড়ে প্রতি থানায় প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০ হাজার। তিন টাকা হিসেবে পাওয়া যায় এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা। একজন প্রেস মালিক হিসাব দিলেন, খরচ বড়জোর ৭৫ হাজার টাকা। উদ্বৃত্ত ৩৫ হাজার টাকা কে পাবে, কার কাছে জমা দিতে হবে তার কোন বিধান প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের আদেশে বলা হয়নি। এভাবে বছরে তিনটি পরীক্ষায় কমপক্ষে একজন থানা শিক্ষা কর্মকর্তার উপার্জন লক্ষাধিক টাকা। সূত্র মতে, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের অধিকাংশই অধিদফতর পর্যন্ত এই টাকার কমিশন দেবার অলিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ।

দেশে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে বাণিজ্য হয় সবচেয়ে বেশি। ভর্তি পরীক্ষার টাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় ফান্ডে সাধারণত জমা হয় না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে বাণিজ্য ওপেন সিক্রেট। এদিকে অভিজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তিকে এখন বলা হয় এবিসিডি। এ-এ্যাডমিশন বা ভর্তি, বি-ব্রাইব বা ঘুষ, সি-করাপশন বা দুর্নীতি, ডি-ডোনেশন, ডেভেলপমেন্ট বা চাঁদা, উন্নয়ন ফী।

দেশে কিন্ডারগার্টেন বা বেসরকারী শিক্ষার জবাবদিহিতা তেমন একটা নেই। 'এটা অনেকটা পারিবারিক ব্যবসা। ইচ্ছামতো টাকা আদায় হয়, আয়-ব্যয়েরও স্বচ্ছতা নেই। রাজধানীর তিনটি অভিজাত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তথা স্কলাস্টিকা, ম্যাপললীফ, বিআইটিসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগে অভিভাবকরা আদালত পর্যন্ত গেছেন। অভিজাত একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান বলেন, যেহেতু সরকারী কোন টাকা তাঁরা নেন না, সেহেতু অভিভাবকদের টাকায় গুণগত শিক্ষা দিতে গিয়ে নানা খাত ও খরচ যুক্ত করতে হয়।

বই লেখাপড়ার বস্তুগত ভিত্তি। তাই বিদ্যা বাণিজ্য হয় বইকে ঘিরে। মুখস্থ বিদ্যার জন্য নোট ও গাইডের বিকল্প নেই। এই সুযোগে ভাড়াটিয়া লেখকের লেখা নিম্নমানের ও ভুলে ভরা নোট ও গাইডে সয়লাব সর্বত্র। ফলে শিক্ষার্থীরা হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত, প্রতারিত হচ্ছেন অভিভাবক। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত গাইড ও নোট নিষিদ্ধ করা হলেও তা থোড়াই কেয়ার করছে একশ্রেণীর অসাধু প্রকাশক। প্রকাশকদের হিসাবেই, বছরে সারাদেশে গড়ে ছয় কোটি টাকার নোট ও গাইডের রমরমা বাণিজ্য চলে।

শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার নানামুখী অসঙ্গতির সুযোগেই বিদ্যার সঙ্গে লোভনীয় বাণিজ্যের সম্পর্ক জেঁকে বসেছে বলে শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মত। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, সুশিক্ষিত লোকমাত্রেই স্বশিক্ষিত। কথাটা সত্য, পাশাপাশি এটিও বাস্তব যে, এমন স্বশিক্ষিত লোকদের চূড়ামণি রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এর অনস্বীকার্যতার কারণেই। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তথা শ্রেণীকক্ষের চেয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকের কাছে এখন প্রাধান্য পাচ্ছে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। কোচিং সেন্টারে যায়নি, প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়েনি, এমন শিক্ষার্থী অজপাড়াগাঁয়েও আজকাল খুঁজে পাওয়া কঠিন।